জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২০

রবীন্দ্রনাথের গান : অর্থবিপত্তি প্রসঙ্গ

ফজলে এলাহি চৌধুরী*

Abstract

Rabindranath Tagore endeavored to keep his lyric and note unblemished to fortify his songs. His impulse was for the unaltered appearance of the Tagore Songs to be followed. Even having the unprecedented blend of lyric and note, his songs sometimes hardly convey the authentic meaning to the listeners. This article studied few of those songs and unfolded the pattern of distractions of the meaning. It demonstrated that singer-dependence to inevitably reflect the art of Tagor Songs, punctuation-interrupted notes, imperative pitches of the notes, reiteration of words, Tagore's inclination to allegory of the familiar words could impede the desired meaningfulness of Tagore Songs. The refraction of meaning could also lead to a different possibility that Rabindranath would not desire.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) জানতেন, সবচেয়ে স্থায়ী হবে তাঁর গান। এই জানাশোনা তাঁকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। তিনি চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রসংগীত স্বমহিমায় গায়কের কণ্ঠকে নির্ভর করুক। সেই 'মহিমা' অনুপুঙ্খভাবে বাণী ও সুরকে অনুসরণ করে তাঁর গানকে উপস্থাপন করবার যোগ্যতার মধ্যে নিহিত ছিল। নিজের গানের প্রতি এমন গভীর সংবেদন সংগীতকারদের মধ্যে বিরল। সমসাময়িক সংগীতস্রষ্টাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রধান পার্থক্য ছিল– তিনি তাঁর গানকে অবিকল্প রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। নিধুবাবু থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা কাব্যসংগীতের যে ইতিহাস তা বাংলা সাহিত্যেরও অপরিহার্য অধ্যায়। তবে উনিশ শতকের গানের সুরগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার তেমন কোনো চেষ্টা আমাদের সাংস্কৃতিক উদ্যমের অঙ্গীভূত হয়নি। যে চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের গানের ক্ষেত্রে করে গেছেন। তিনি তাঁর গানের স্বরলিপি করেই ক্ষান্ত হননি। সেই গান যেন গীতিকবিতারূপেও কেউ আস্বাদন করতে পারেন, সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে প্রথম প্রকাশিত *গীতবিতানে*র [প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৩৩৯] কালানুক্রমিক বিন্যাসকেও তিনি বদলে দিয়েছেন। ফলে, পরবর্তী সময়ে ভাবের অনুষঙ্গ বজায় রেখে বিন্যস্ত হয়েছে *গীতবিতান*। আবার, *গীতবিতানে*র বিন্যস্ত বাণীকে গানের স্বরলিপিতে বিন্যাস করতে গিয়ে তিনি গানের ভাবকে আরও স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। কোনো বিশেষ ভাবকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কখনো-বা পুনরুক্তিপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। ফলে, 'তিমির অবগুণ্ঠনে'[১] গানটিতে তমাল বনের 'মর্মর'-এর প্রতিধ্বনি 'মরি মরি'তে শোনা যায়, নদীর জলের 'ঝর্ঝরে'ও 'ঝরি ঝরি' পুনর্ব্যক্ত হয় কিংবা 'কে তুমি' শব্দের সুরবিন্যাসের বিভিন্নতা ও 'কে তুমি' শব্দের পুনরুক্তি গানটিকে ব্যঞ্জনা-ঋদ্ধ করে। *গীতবিতান*-এ গানটির লিখিত-বাণীতে উল্লিখিত বিষয়গুলি পাওয়া যায় না। কখনো-বা গানের বাণীতে নেই, অথচ সুরে সেই বাণী রয়েছে এমন সংযোজন করেছেন তাঁর অসংখ্য গানে। যেমন, 'গানগুলি মোর শৈবালেরই দল' বলেই 'আহা' শব্দটি যুক্ত হচ্ছে। আবার, গানের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলতে তিনি পাঠভেদও রেখেছেন; কখনো-বা সুরান্তর[২]। তাঁর সৃষ্ট অপরাপর শিল্পের মধ্যে কেবল গান নিয়ে উচ্চাশী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে তবু রয়ে যায় অর্থবিপত্তি। এই সকল বিপত্তির ধরন কী, তা কতটুকু সাংগীতিক, আর কতটুকুই-বা সাংগীতিক নয় সেটি গুরুতর বিবেচনার দাবি রাখে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

২

গায়কের কণ্ঠকে নির্ভর করে যেকোনো গানই আত্মপ্রকাশ করে, এটি সংগীতকারকে ভীষণ অসহায় করে দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ কথাটি দারুণভাবে সত্য। 'গীতালি'র অন্যতম উদ্যোক্তা প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশকে রবীন্দ্রনাথ অনুনয় করে বলেছিলেন–

> আমার গান যাতে আমার গান ব'লে মনে হয় এইটি তোমরা কোরো। আরো হাজারো গান হয়ত আছে– তাদের মাটি করে দাও না, আমার দুঃখ নেই। তোমাদের কাছে আমার মিনতি– তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনে নিতে পারি। এখন এমন হয় যে, আমার গান শুনে নিজের গান কি-না বুঝতে পারি না। মনে হয় কথাটা যেন আমার, সুরটা যেন নয়। নিজে রচনা করলুম, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য। মেয়েকে অপাত্রে দিলে যেমন সবকিছু সইতে হয়, এও আমার পক্ষে সেইরকম। বুলাবাবু, তোমার কাছে সানুনয় অনুরোধ– এদের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিও– এটাই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপর তোমরা যদি স্টিমরোলার চালিয়ে দাও, আমার গান চেপ্টা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও মীড় থাকে, সেই চেষ্টা তুমি কোরো।[৩]

গায়ক-নির্ভরতার ব্যাপারটি যদি অনুকূল অর্থে ধরে নিই, তবু কেবল 'চেষ্টা'য় কি সম্ভব স্বরলিপিকে বজায় রেখে গানকে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুযায়ী সার্থকভাবে অপরের কাছে পৌঁছে দেয়া?– তা বোধ করি দুরূহ, কারণ, যেখানে স্বরলিপি বিগ্রহ[৪] রয়েছে, সেখানে কীসে নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথের গান অর্থবহরূপে শ্রোতার কাছে পৌঁছবে, তা নিয়ে বিভ্রম তৈরি হতে পারে। 'রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি সমস্যা' নামের একধিক প্রবন্ধ স্বরলিপিকে বিবেচনাযোগ্য করেছে যতটুকু, ততটুকু গ্রহণযোগ্য করেনি। আলপনা রায় স্বরলিপির সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন[৫]। এই শতকের প্রথম দশকের শুরুতে অধ্যাপক সন্‌জীদা খাতুন স্বরলিপির বিবর্তন নিয়ে বিশ্বভারতীতে গবেষণা করেছেন। তাঁদের ভাষ্যকে মানলে, স্বরলিপি যতটা মেনে চলছি আমরা, প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বরলিপি ততটা মান্য হতে পারেনি।[৬] তবু, রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে সদ্‌গুরুপরম্পরা যেহেতু বিরল, নিরুপায় হয়ে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তাকে মাথায় রেখে গানের পরিকাঠামোকে মেনেই রবীন্দ্রগানের স্বরূপ এবং এর অর্থ অনুধাবনে অগ্রসর হওয়া যায়।

৩

গানে উচ্চারণভেদের সঙ্গে কেবল 'ভুল' উচ্চারণের ব্যাপার জড়িত নয়, এর সঙ্গে অর্থভেদ বা অর্থান্তরের সম্পর্ক আছে। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতে এবং স্বরলিপিতে দেখা যায়, 'এ'-ধ্বনি [e] এবং 'অ্যা'-ধ্বনির[æ]উচ্চারণ নির্দেশ করা আছে। এই সতর্কতা যেমন সাহায্য করে ঠিক অর্থে পৌঁছতে, তেমনই অননুমেয় মুদ্রণপ্রমাদ কখনো-বা ভুল অর্থের দিকে শ্রোতাকে নিয়ে যায়। একবার, প্রেম পর্যায়ের ৩১৯ নম্বর গান 'আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী' গানটির 'হেরে' শব্দের কোন্ উচ্চারণটি বিধেয়, 'হেরে' না কি 'হ্যারে'– এই নিয়ে তর্ক উঠেছিল বলে শঙ্খ ঘোষ তাঁর *গদ্যসংগ্রহ* পঞ্চম খণ্ডের 'নিরন্তর সম্পাদনা' প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন[৭]। মাধুরী দেখবার পর মন চেয়ে থাকে মনে মনে? না কি মনে মনে চেয়ে থাকে মন, আর তখনই দেখা যায় মাধুরী? বিশ্বভারতীর বইগুলিতে এ-কারের সামান্য-একটু চিহ্নবৈষম্য(ে/ে) দিয়ে উচ্চারণভেদ বুঝিয়ে দেবার রীতি আছে। সেই চিহ্ন থেকে তর্কের মীমাংসা মেলাতে দেখা গেল *গীতবিতান*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে স্পষ্টই ছাপা আছে 'হেরে মাধুরী'। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালের সংস্করণ ১৩৪৫-৪৬ সালে কবিরই তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়েছিল, সেখানে শঙ্খ ঘোষ দেখতে পেলেন 'হেরে' নয় 'হেরে'-ই ছাপা হয়েছিল তখন, যা ঐ শব্দের উচ্চারণ এবং গানটির অর্থ সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষের ধারণার অনুকূল ছিল।[৮] গানের বাণীতে ক্রিয়াপদের রূপটি সমাপিকা হবে, না-কি অসমাপিকা তা অনেকসময় বুঝবার কোনো উপায় থাকে না। বাংলা গানে বা কবিতায় বাংলা গদ্যের তুলনায় বিরামচিহ্নের ব্যবহার কম থাকাটা স্বাভাবিক। সমৃদ্ধমান উর্দু ভাষার

কবিতায় বিরামচিহ্ন একেবারেই ব্যবহৃত হয় না। উর্দু গানের বাণীতেও নয়। ভাষার এই বিরামবিহীনতা 'ভাষিক বিপত্তি' নয়, বরং ওই ভাষায় কেবল 'সম্ভাবনা' হিসেবেই বিবেচনা করা হয়।[৯] অন্যদিকে, বাংলা গানে, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতের বাণী রচনায় রবীন্দ্রনাথ এমনকি উচ্চারণভেদটুকুও বুঝিয়ে দিতে চেয়ে মাত্রাযুক্ত এ-কার (ে) এবং মাত্রাবিহীন এ-কার (ে) ব্যবহার করেছেন। ফলে, তা গান-স্রষ্টার এই অভিপ্রায়টুকু যথাযথভাবে তাঁর বাণীকে পৌঁছে দেবার পরম আকাঙ্ক্ষাই নির্দেশ করে। *গীতবিতানের* এই বিভ্রম সাধারণ পাঠক-গায়ক-শ্রোতাকে অতটুকু কৌতূহলী করে না সচরাচর, যে কৌতূহলের কারণে অর্থের এই বিপত্তি নিরসনে অগ্রসর হওয়া যায়। আর, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের রচনার নানান সংস্করণও সুলভ নয়, যা বিশ্বভারতীতে সংরক্ষিত রয়েছে। শঙ্খ ঘোষের মতো বিদগ্ধজনদের জন্যে যা অনায়াস, তা বাংলাদেশের গবেষকদের জন্যে এক দুঃসাধ্য প্রক্রিয়া। উদ্বেগের বিষয় যে, *গীতবিতানে* এবং স্বরলিপিতে শঙ্খ ঘোষ নির্দেশিত সেই ভুলটি এখনও শুধরানো হয়নি।[১০] ফলে, ওই গানের অর্থটি বিপত্তির মুখে পড়ে থাকবে চিরকাল।

৪.

গানের কথা ও সুর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, '...সুর যে জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া পৌঁছতে পারিত না।'[১১] এখন, দেখা যাক, সুরবিন্যাসই যেখানে অর্থবিপত্তির কারণ, সেখানে সেই সুর রবীন্দ্রনাথের বাণীকে কতদূরই-বা উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।

পূজা পর্যায়ের ২০১ সংখ্যক গান 'আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন' – বাণীর ছন্দটি স্বরবৃত্তের। বাণীর ছন্দে যেখানে পর্ব পড়ছে, সেখানে সুরের বিরতি দেয়া সম্ভব হবে না, দিলেও তা সাংগীতিক হবে না। ফলে, 'আমার সকল দুখের প্রদীপ/ জ্বেলে দিবস/ গেলে করব নিবেদন' শুনেই খুশি থাকতে হচ্ছে এই গানে। দিবস গেলে নিবেদন করবার বিষয় সুরের বিন্যাসগত কারণে আর খুঁজে পাওয়া যায় না কোনো গায়কীতেই। পাঠকের কারণে গানের কবিতা যা *গীতবিতানে* রক্ষিত, তা কখনো ব্যর্থ হয় না, কিন্তু গায়ক যখন গানকে পরিবেশন করছেন, তখন গায়কের কারণে গানের অর্থ ব্যহত হচ্ছে।গানের বাণীর ছন্দের যে পর্ববিভাজন, তা বজায় রেখে পাঠ করলে দিবস গেলে নিবেদন করবার বিষয়টা পাওয়া যায়, অথচ গানে সেই অর্থটা আর থাকছে না। এমনটি হবার কারণ হিসেবে বলা যায়, গানটি শুরু হয়েছে পঞ্চদশ মাত্রা থেকে এবং ষোলো মাত্রা পর্যন্ত গাইলে 'প্রদীপ' পর্যন্ত গাওয়া হয়। এর পর আর দম ধরে রাখা সম্ভব হয় না। পরবর্তী দুই মাত্রায় 'জ্বেলে' শব্দটি থাকলেও তা একদমে গাওয়া যায় না। গাইলেও শ্রোতাদের আরাম হয় না শুনতে। ফলে, বিরামটি সেখানে গিয়েই পড়ে। আর, পরবর্তী সুরবিন্যাসে বিরামের ফাঁদ পাতা থাকে 'জ্বেলে দিবস' বলবার পরই–

সা সা I I [স]ণ্া -া সা -া । সমা -মজ্ঞা মা -া I [ম]পা -া পা -া । -জ্ঞা -া জ্ঞা মা I

আ মার্ স ০ ক ল্ দু০ ০০ খে র্ প্র ০ দী ০ ০ প্ জ্বে লে

I মা -পা পা -া । -া -া পা ধা I [ধ]ণা -া ণা -া । [-ণ]ধা -র্সা [র্স]ণা দা I

দি ০ ব ০ ০ স্ গে লে ক র্ ব ০ ০ ০ নি বে

I পা -া -া -া । -া -া [১২]

দ ০ ০ ০ ০ ন্

পূজা পর্যায়ের ৬০৪ সংখ্যক গান 'মধুর, তোমার শেষ যে না পাই' রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানের অর্থবিপত্তির কারণটি নির্দেশ করতে পারে। এই গানের বাণীতে 'মধুর' বলবার পর কমা রয়েছে– বোঝা যায়, এটি সম্বোধন। এমনতর সম্বোধন ও কমা ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানে। অথচ বিরাম বোঝাবার সুযোগ থাকে না অধিকাংশ সুরবিন্যাসে। এই গানে 'মধুর' বলবার পর বিরতি দেবার সুযোগ নেই বললেই চলে। বিরতি দিতে গেলে তা সাংগীতিক হয় না। শ্রোতাদের কানে এসে লাগে। আবার, বিরতি না দিলে সম্বোধনটি বোঝা যায় না। বক্তব্যের সমর্থনে গানের সুরবিন্যাস লক্ষ করা যাক–

I I{ সা রা গা। গা গা -া I গা -া -া। গা গা -রা I গমা -পা -া।[১৩]

ম ধু র তো মা র্ শে ০ ষ্ যে না ০ পা০ ০ ই

অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে, পূজা পর্যায়ের ৯ সংখ্যক গান 'অরূপ, তোমার বাণী'তে। এই গানে সম্বোধন করা হয়েছে, 'অরূপ' বলে। অথচ, মনে হচ্ছে বাণীকে অরূপ বলা হয়েছে–

পা I I পধা -া -া। -না -ধা না I র্র্সা -া -া। -ধা -পা -মা I

অ রূ০ ০ ০ ০ প্ তো মা০ ০ ০ ০ ০ র্

I গা -রা -গা। -মা -পা -ম I গা -া -রা। -র্সা -া -া I[১৪]

বা ০ ০ ০ ০ ০ ণী ০ ০ ০ ০ ০

গানের শব্দ উচ্চারণে প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সাংগীতিক না হলেও, গান গাইবার সময় গানের অর্থকে বজায় রাখতে গিয়ে কোথাও-বা অনিবার্য বিরতি নির্দেশকের প্রয়োজন হয়। এই বিরতির নির্দেশনা হিসেবে স্বরলিপিতে ওই শব্দটির পর 'কমা' চিহ্ন ব্যবহার করলে গানের মহিমা বজায় থাকতে পারে। পুরাতন পত্রিকায় প্রকাশিত স্বরলিপিতে কাঙ্গালীচরণ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবীরা মাঝে মাঝে কমা ব্যবহার করতেন।[১৫] এই বিরামচিহ্নটি প্রচলিত স্বরবিতানে না থাকায় 'পথের শেষ কোথায়'[১৬] গানটিতে 'মনে ভয়/ লাগে সেই' গেয়ে থাকেন গায়কগণ সুরের বিন্যাসগত কারণে। 'মনে/ভয় লাগে সেই' এমনই হবার কথা উচ্চারণ প্রয়াস। স্বরলিপিতে 'মনে' শব্দটির পর কমা ব্যবহার করলে বিভ্রান্তি এড়ানো যেত।

প্রেম পর্যায়ের ২৭৫ সংখ্যক গান 'যখন এসেছিলে অন্ধকারে/ চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে॥' – 'যখন এসেছিলে' কথাটা সুরে পরপর দুইবার বিন্যস্ত থাকায় অর্থের বিপত্তিটা ঘটে। তখন অর্থটা এমন মনে হয়– 'যখন এসেছিলে/ অন্ধকারে চাঁদ ওঠেনি'। গানের প্রকৃত অর্থ তখনই পাওয়া যাবে, যখন বাণীর বিন্যাসটা এমন পাওয়া সম্ভব হবে– যখন এসেছিলে অন্ধকারে/ চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে। বাণীর পুনরুক্তি ঘটবার কারণে সেই সম্ভাবনাটি গানের সুরবিন্যাসে অবশিষ্ট থাকে না–

I I -া -া সা। রা -া। সা -রা I ন্া -া -সা। রা জ্ঞা। রা -া I

০ ০ য খ ন্ এ ০ সে ০ ০ ছি ০ লে ০

I -রা -পা মা। জ্ঞা -রা। সা -রা I ন্া -সা -রা। রা পা। মজ্ঞা -া I

০ ০ য খ ন্ এ ০ সে ০ ০ ছি ০ লে০ ০

I রা -া জ্ঞা। রা -া। মজ্ঞা -রা I সা -া রা। ন্া -া। সা -া I

অ ন্ ধ কা ০ রে০ ০ চাঁ দ্ ও ঠে ০ নি ০

I গা -া মা। রা -া। মজ্ঞা -রা I সা -া রা। ন্া -া। সা -া I [১৭]

সি ন্ ধু পা ০ রে০ ০ চাঁ দ্ ও ঠে ০ নি ০

আবার, পূজা পর্যায়ের ২৫ সংখ্যক গান 'সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে/ বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে' প্রসঙ্গে বলা যায়, আঠারো মাত্রা গাইবার পর শিল্পী দম নিচ্ছেন; পরবর্তী আঠারো মাত্রা গাইবার পর আবার দম নেবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তাঁর মধ্যে। ফলে, গানটি দাঁড়াচ্ছে এমন– 'সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই/ কেবল কাজে বুকে বাজে/ তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে'। ফলে, অনিবার্যভাবেই অর্থবিপত্তি ঘটছে–

I I মা -দা দা। দণা র্সা -ঋা I [র্]ণা র্সা -ঋর্জ্ঞা। [র্ম]র্জ্ঞা ঋা -র্জ্ঞঋা I

সু র্ ভু লে০ যে ই ঘু রে ০০ বে ড়া ০০

I [-ঋ]র্সা -া -া। -া -া -া I র্সণা ণর্সা -ণঋা। ঋা র্সা -া I

০ ০ ই ০ ০ ০ কে০ ব০ ০ল্ কা জে ০

I [-র্স]ণা -ণপা -পণা। [ণ]দা পা -দা I -মপা -জ্ঞা -া। -া -া -া I

বু কে০ ০০ বা জে ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা ণদা -া। ণা র্সা -ঋা I [ঋ]ণা -র্সঋা ঋা। [ঋ]র্সা ণদা -পা I I[১৮]

তো মা০ র্ চো খে র্ ভ র্ৎ স না যে০ ০

প্রেম পর্যায়ের ৫ সংখ্যক গান 'গানগুলি মোর শৈবালেরই দল–' গানটি সুচিত্রা মিত্রসহ প্রখ্যাত শিল্পীদের কণ্ঠে শুনবার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, 'শৈবাল' শব্দটির উচ্চারণে মধ্যখণ্ডন ঘটে। সুরবিন্যাসের ধরনটি এবার লক্ষ করি–

পা -ধা I [ধ]মা -পা [ম]পা জ্ঞা। রা -া [১৯]

শ ই বা ০ লে রি দ ল্

গানের ছন্দের পর্ববিভাজনে গানের বাণীর পদবিভাজন হওয়ায় এই ধরনের অর্থ-বিপত্তি ঘটছে, প্রাথমিক স্বরলিপিতে যেরকমভাবে 'কমা' ব্যবহার করা হতো, সেইরকমভাবে বিরাম-নির্দেশক ব্যবহার করলে তা ঘটতে পারতো না। যেহেতু মধ্যখণ্ডিত শব্দের পরবর্তী শব্দ 'বালেরি'র সুরে দুইটি স্পর্শ স্বরের ব্যবহার রয়েছে, তাই ওই অংশটি আলাদাভাবে ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে প্রকট হয়েছে এই গানে। এবং, তা সংগীতশিল্পীর পক্ষে পূর্ণাঙ্গ 'শৈবাল' শব্দটি প্রধান হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে, শুরুর অংশে 'শই' উচ্চারণের প্রভাবেই হয়ত 'বসন্ত' নাটকে 'কবি'র গাওয়া[২০] এ গানটি পুরুষ শিল্পীরা এড়িয়ে চলেন। যদিও এই 'শই'য়ের সঙ্গে সখির কোনো সম্পর্ক নেই। এবং 'বালেরি'র সঙ্গে নিকটবর্তী ভাষার কোনো শব্দ বা শব্দার্থেরও কোনো সম্পর্ক নেই।

একইভাবে, প্রেম পর্যায়ের ১৯৪ সংখ্যক গান 'ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী' গানে প্রথমত সুরের বিন্যাসের কারণে 'ও' আলাদা হয়ে যায়, একই রকম নিকটবর্তিতা তৈরি হয় 'গো' এর সঙ্গে 'আমার'

শব্দটির। 'গো' এবং 'আ' মিলে একধরণের ব-শ্রুতি ধ্বনি বা অর্ধস্বরধ্বনি বা অর্ধব্যাঞ্জন ধ্বনি তৈরি করে অর্থবিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়–

I I পা -ধা | পা -র্সা র্সর্রা I র্সণর্সণা -ধণা | ণধা পা ধপা I[২১]

ও ০ গো ০ আ০ মা০০ ০০ র চি র০

কখনো-বা একক প্রয়াসে উচ্চারণ করতে হয় এমন শব্দের মধ্যবর্তী অংশের সুরের উচ্চনিচতায় অন্বিষ্ট কাব্যবস্তু বিপত্তির মুখে পড়ছে। যেমন, নৃত্যনাট্য *চণ্ডালিকায়* চণ্ডালিনী 'প্রকৃতি' আত্মস্বরূপ চিনে নেবার পরম মুহূর্তে যখন উচ্চারণ করছে 'মরণের সিংহদ্বার ওই খুলছে'– তখন স্বরবিন্যাসের ধরনে অধিকাংশ গায়ক-গায়িকা যা গাইছেন, তাতে মনে হতে পারে 'মরণের সিংহ' বুঝি-বা 'দ্বার' খুলছে। স্বরবিন্যাসটি এইরকম:

I র্সা র্সর্জ্জা র্জ্জা র্জ্জর্ঋা | র্জ্জর্ঋা -া র্সা -া I র্সা -র্জ্জা র্জ্জা -র্ঋা | র্জ্জর্ঋা -া র্সা -া I[২২]

ম র০ ণে র০ সিং ০ হ ০ দ্বা র ও ই খু ল্ ছে ০

সুরের উচ্চনিচতায় 'সিংহদ্বার' শব্দটির যৌথতা ভেঙে যেতে থাকে। ফলে 'মরণের সিংহ' 'দ্বার' খুলে দিতে থাকে এই গানে– যা অর্থবিপত্তিকর। রবীন্দ্রনাথের গানে চেনা শব্দে অচেনা আবহ *গীতবিতানে* ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ফলে, মরণের সিংহ যদি কখনো দ্বার খোলে তো অবাক হবার তো কিছু নেই। উপরিউক্ত সুরে আমরা লক্ষ করেছি, 'সিংহদ্বার' শব্দটির একটি অংশ 'সিংহ' শব্দটি উচ্চারণ করবার পর কাহারবা তালের আবর্তন শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাকি শব্দাংশ 'দ্বার' পড়ছে তালের পরবর্তী আবর্তনের শুরুতে সম-এ গিয়ে। ফলে, গায়কদের একটা ঝোঁক থাকছে আবর্তন শেষে একটু কেটে উচ্চারণ করবার।

এবার, প্রেম পর্যায়ের ১৫৭ সংখ্যক গান 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে' প্রসঙ্গে সর্বশেষ কিছু কথা বলা যেতে পারে। এই গানের বাণীতে 'ভালোবাসার' শব্দের সঙ্গে 'ই' প্রত্যয়টি আলাদা করে দেয়া আছে। অথচ, সুরে যে বাণীটি বিন্যস্ত হতে দেখা যায়, তাতে লেখা আছে এমন: 'ভালোবাসারি ঘায়ে'। ই-প্রত্যয়টি আলাদা করে যুক্ত হয়নি। ফলে, সুরবিন্যাসে গিয়ে 'রিঘায়ে' নামের এক নতুন অচেনা শব্দ কানে এসে বাজছে। যার অর্থ অপরিণত শ্রোতাদের জানা নেই; পরিণতগণ অবশ্য মূল অর্থটি অনুধাবন করতে পারেন–

I I রা পা | পমা গা রা | রা -া | রা -া -া I

কাঁ দা লে তু মি মো ০ রে ০ ০

I রা গা | মা পা পা | পধা -ধপা | মা -া -গা I[২৩]

ভা লো বা সা রি ঘা০ ০ য়ে ০ ০

গোটা কৈশোর কারো কেটে যেতে পারে, কী করে ভালোবাসা 'রিঘায়', সেই কথা ভেবে। আর, তখন, অস্তিত্ব বিচূর্ণ করা বিস্ময়ে কেউ বুঝে নিতে পারে, ভালোবাসা 'রিঘালে', নিবিড় বেদনায় গায়ে পুলক এসে লাগে। রবীন্দ্রনাথের গানে যদি 'শুকতারা আঁখি মেলে' চাইতে পারে, যদি 'শেফালি বনের মনের কামনা' ঝরে পড়তে পারে, তবে ভালোবাসা 'রিঘালে' তো দোষের কিছু নেই। বরং তা বাগর্থিক-বিপত্তিরই এক দার্শনিক উত্তরণ। কারণ, চেনা শব্দে অচেনা আবহ নির্মাণ করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর

গানে। ফলে, অচেনা শব্দে অচেনা কোনো আবহ, যা সুরবিন্যাস উস্‌কে দিচ্ছে কারো কারো মনে কখনো-বা, তা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না, নিরর্থক হলেও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানকে সবচেয়ে স্থায়ী করবার অভিপ্রায়ে বাণী ও সুর বজায় রাখার চেষ্টা করে গেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের অবিকল্প রূপ যেন অনুসৃত হয়, সে বিষয়ে তাঁর গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। লক্ষ করা যায়, তাঁর গানের বাণী ও সুরে অপূর্ব সম্মিলন ঘটলেও কখনও-বা রবীন্দ্রসংগীত যথাযথ অর্থ নিয়ে শ্রোতার কাছে পৌঁছতে পারে না। তাঁর গানের অর্থবিপত্তির স্বরূপ হিসেবে দেখা গেল–রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পের প্রকাশে অনিবার্য গায়ক-নির্ভরতা, কখনও-বা বিরামবিঘ্ন সুর ও সুরের উচ্চনিচতার ধরন, সুরে বাণীর পুনরুক্তি এবং অনিবার্যভাবেই চেনা শব্দে অচেনা আবহ নির্মাণের রবীন্দ্র-প্রবণতা কখনও-বা রবীন্দ্রসংগীতের অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করে দিতে পারে। কিংবা, অন্যতর কোনো সম্ভাবনার দিকেও নিয়ে যেতে পারে এই সকল অর্থগত প্রতিসরণ– যা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল না।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নবগীতিকা* প্রথম খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৬), পৃ. ৩০–৩১
২. এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ২০০২ সালে চাঁদপুরের রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনের একবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে ওয়াহিদুল হক ‘সংকোচের বিহ্বলতা’ গানটির পাঠান্তর ‘সন্ত্রাসের বিহ্বলতা’ গাইয়েছিলেন; তাছাড়া ‘আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে’র মতো অসংখ্য গানের সুরান্তর রয়েছে, যা গাওয়া হয়ে থাকে।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৯২), পৃ. ২৬২
৪. “...যাঁরা কেবলমাত্র স্বরলিপির আনুগত্য স্বীকার করে এ ধরনের গান গাইবেন, তাঁরা সে-সব গানের উপর অত্যন্ত অবিচার করবেন। সে-সব গানের গায়কী পদ্ধতিটি শুনে না শিখলে সব মাটি। ‘সখী, আঁধারে একেলা ঘরে’, ‘বেদনা কী ভাষায় রে’, ‘বাজে করুণ সুরে’, ‘বন্ধু, রহো রহো সাথে’ ও ‘কখন দিলে পরায়ে’ ইত্যাদি গান ক’টি স্বরলিপি আকারে প্রকাশিত হয়েছে নানা পুস্তকে। এইখানে প্রত্যেক সংগীতানুরাগীকে মনে রাখতে হবে যে, এই সব স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ যখন তৈরি করেন তখন স্বরলিপির নিয়মে বাঁধবার জন্যে কোনো গান চার মাত্রা কোনো গান তিন মাত্রা দাদ্‌রা, সাতমাত্রা তেওড়া ইত্যাদি নানারকম ছন্দের মাত্রায় তাকে স্বরলিপি লিখতে হয়েছিল। স্বরলিপি দেখে কেউ যেন মনে না করেন, গুরুদেব বা দিনেন্দ্রনাথ উভয়েই স্বরলিপির ছন্দে এই সব গান গাইতেন। আমার শান্তিনিকেতনবাসের জীবনে রচিত যাবতীয় গান-রচনা এবং শিক্ষার সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম বলেই এ কথা আরও জোর দিয়ে বলতে পারছি।”
– শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৪০৮), পৃ. ১৩৯–৪০
৫. “এই প্রসঙ্গে ‘মেঘের পরে মেঘ জমেছে’ গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা জানি এই গানের স্বরলিপিকার তিনজন: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কেতকী, ১৩৪৬), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গীতলিপি, তৃতীয় খণ্ড, ১৯১০–’১৮’র মধ্যবর্তী কোনো সময়), এবং ভীমরাও শাস্ত্রী (সংগীত গীতাঞ্জলি, ১৮৪৭)। দিনেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের স্বরলিপি দু’টি যথাক্রমে *স্বরবিতান* একাদশ খণ্ড (কেতকী) ও সপ্তত্রিংশ খণ্ডে স্থান পেয়েছে মূলরূপ হিসেবে, এবং ভীমরাও শাস্ত্রী-কৃত স্বরলিপিটি আছে *স্বরবিতান* সপ্তত্রিংশ খণ্ডের পরিশিষ্টে ‘সুরান্তর’ অংশে...”
– আলপনা রায়, ‘রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি: কিছু সমস্যা’, *আলাপ থেকে বিস্তার* (কলকাতা : প্যাপিরাস ১৩৯৯), পৃ. ৭৪
৬. “...ভুল অনেকেই করেছেন। তবে সে-সব ভুল সংশোধনের দায়িত্ব নিয়েছেন খুব কম জনেই। সংশোধনের দায়ে যাঁরা কঠোর ভাষায় অভিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদেরই ভুল আমি বেশি করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।...সংশোধন করতে গিয়ে জটিল কারুকার্য যোগ করা কতটা সংগত ও সৌজন্যসম্মত হয়েছে, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে।...কারুকাজের অভাবের দরুনই কি বিশেষ করে এই দুজনের স্বরলিপি ‘সম্পাদনা’ করবার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল? এ জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার জন্যে সম্পাদকদের কেউই আর আজ বেঁচে নেই।”
– সন্‌জীদা খাতুন,‘রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপির কথা’, *সাহিত্য-কথা সংস্কৃতি-কথা* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন ১৪১১) পৃ. ৫৭
৭. শঙ্খ ঘোষ, ‘নিরন্তর সম্পাদনা’, *গদ্যসংগ্রহ* পঞ্চম খণ্ড (কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং ১৪০৯), পৃ.৩২১
৮. অভী চৌধুরী, *নিহিতার্থের খোঁজে*(কলকাতা : মনফকিরা ২০১১),পৃ.৩৭

৯. কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয় ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের আধুনিক ভারতীয় ভাষার অধ্যাপক ফ্রান্সেস প্রিচেট কবিতায়, বিশেষ করে ধ্রুপদী উর্দু কবিতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলছেন, "দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ইংরেজি ভাষায় যতি চিহ্ন রয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক যে আধুনিক সম্পাদকরা গালিবের কাব্যগ্রন্থে যতি চিহ্ন প্রয়োগ করেন। তাদের ওপর অভিশাপ পড়ুক। কখনোই ওদের হাতে বোকা হবেন না। কখনোই তাদের আপনার নিজ পাঠ প্রভাবিত করতে দেবেন না। গালিব বেঁচে থাকলে আরও ক্ষুব্ধ হতেন এই কারবারে।"–https://youtu.be/jnmzgG54KWAy; ভ্রমণ তারিখ : ২০আগস্ট ২০২০ [দ্র. ৩৫.৪৮ – ৩৬.৫৫ মিনিট]

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (কলকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৮০), পৃ. ৩৯৭; *গীতমালিকা* প্রথম খণ্ড (কলকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৭৬), পৃ. ১২০

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতপঞ্চাশিকা* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৭৭), পৃ. ১৩৬

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৭৭), পৃ. ৯৬

১৪. *তদেব*, পৃ. ১০২

১৫. "...এমনকি সরলা দেবীকৃত স্বরলিপিতে লয়াঙ্ক ও স্বরের হ্রাসবৃদ্ধির নির্দেশ থাকতো; সর্বসাধারণের গ্রহণক্ষমতা বিচার করে জটিলতা পরিহারের জন্যে তা বর্জন করা হয়।"
–সন্‌জীদা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* ষট্‌পঞ্চাশত্তম খণ্ড (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৭৭), পৃ. ৪০

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতিমালিকা* প্রথম খণ্ড (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৭৬), পৃ. ১৫১

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতিবীথিকা* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৭৭), পৃ. ৪১

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বসন্ত* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৭৮), পৃ. ৬৮

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* ঊনষষ্টিতম খণ্ড (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৭১), পৃ. ২৮

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৪৫), পৃ. ১১৪

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী ১৩৭৭), পৃ.১৪৬